গবেষণার সারসংক্ষেপ

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিবেশভাবনা (১৮৫৫-১৯৬৪)

আদিবাসী গ্রামীণ সমাজ দীর্ঘদিন চর্চার অভাবে সমাজের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক বর্ণনায় এদের উল্লেখ থাকলেও বর্বর, অসভ্য, জংলী হিসেবে প্রতিভাত করা হয়। ফলত, বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে তাদের স্বতন্ত্র সমাজ সংস্কৃতির চর্চার দিকটি। পশ্চিমী ভাবধারা ও সংস্কৃতায়নের নামে সাংস্কৃতিক শোষণের বহমান ধারায় এই ইতিহাসের যে টুকু ব্যাখ্যা হয়েছে তা একেবারে একমুখী। এর অনিবার্য পরিণামে আদিবাসীদের বিশ্ববীক্ষা ও চেতনাকে অতিকৌশলে এক নির্ব্বাকায়নের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমি থাকা সত্ত্বেও হুলের মতো কিছু ঘটনার নিরিখেই তাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলত, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা প্রসঙ্গ অনালোচিত থেকেছে। তবে নিম্নবর্গের চর্চার সূত্র ধরেই আরো গভীরে স্বতন্ত্রভাবে আদিবাসীদের নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পৃথিবীর প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের এলাকা ভিত্তিক স্বতন্ত্র এক পরিচিতি রয়েছে। আদিবাসী সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত সাঁওতালরা সাঁওতাল পরগণায় স্বতন্ত্র গ্রামীণ সমাজ কাঠামো গড়ে তুলেছিল। সাঁওতাল পরগণার গঠন ও ভৌগলিক পরিমন্ডল এই স্বতন্ত্র গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় অনন্যতা প্রদান করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ের নেহেরু যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই সময় পর্বে বিভিন্ন প্রতিকূলতা যেমন—ঔপনিবেশিক সরকারের নানান আইন-কানুন, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী নেহেরুর নেওয়া উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি তথ্যনিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এই সময়কালে বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে সাঁওতাল জনজীবনে কী ধরনের ভাঙনের সৃষ্টি করেছিল, সেটিকে বুঝতে এই গবেষণা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে স্থান বা ভৌগোলিক ভূখণ্ড হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে সাঁওতাল পরগণাকে, কারণ এর পরিবেশগত দিকটি এই গোষ্ঠীর

কাছে ছিল এক আদর্শগত স্থান। তবে পাহাড় ও জঙ্গলময় এই এলাকাটির আদি বাসিন্দা ছিল পাহাড়িয়া নামে এক জনজাতি। সাঁওতালরা এখানকার আদি বাসিন্দা ছিল না, বহিরাগত হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চলে আসতে থাকে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে এই এলাকার নাম ও সীমানা বার বার বদলাতে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই এলাকাটির নাম ছিল 'জঙ্গলতরাই'। ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ প্রশাসকরা এর নামকরণ করে 'দামিন-ই-কোহ'(পাহাড়ের প্রান্তদেশ), এর দু-দশক পরে অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে এই এলাকাটি সাঁওতাল পরগণা নামে পরিচিত হয়। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী কালে এলাকাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ২০০০ সালে বিহার থেকে আলাদা হয়ে 'ঝাড়খন্ড' রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভৌগোলিক বা স্থানিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী ইতিহাস চর্চায় সাঁওতাল পরগণার গুরুত্ব এক ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত। কারণ ভারতবর্ষের কোনো অংশে কোনো বিশেষ জনজাতির নামে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে ওঠেনি, একমাত্র ব্যতিক্রম 'সাঁওতাল পরগণা'। আর এ প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে ১৮৫৫-৫৬ সালের বিদ্রোহটি স্মরণীয়, কেননা ১৮৫৫ সালে এই এলাকাটি 'দামিন-ই-কোহ' থেকে 'সাঁওতাল পরগণা' নামে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ করা যায়, তা নিঃসন্দেহে তাদের আত্মপরিচয় বা Identity-এর সমার্থক। এই সময়কাল পর্যন্ত দিকু মহাজন বা জমিদারদের আধিপত্য থাকলেও জনসংখ্যার নিরিখে সাঁওতালরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ, এমনকি এখানে পাহাড়িয়া ব্যতীত অন্য কোনো জনজাতির অস্তিত্ব ছিল না। ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতা থেকে মুক্ত ছিল 'দামিন-ই-কোহ'। যা পূর্বতন জঙ্গলমহল বা সিংভূম অঞ্চলে জমিদারি অত্যাচার 'দামিন-ই-কোহ'-তে সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণের সূচনা করে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার সাঁওতাল পরগণা সাঁওতালদের আদি বাসভূমি ছিল না, ব্যাপক অভিপ্রয়াণই এর জন্মদাতা। একই সাথে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব লাভের বিষয়টিও এর সঙ্গে সংযুক্ত। সাঁওতাল পরগণার আদি বাসিন্দা পাহাড়িয়ারা ঝুম চাষ ব্যতীত কৃষিকাজে আগ্রহী ছিল না, উপরন্তু এরা ছিল দস্যু প্রবণ। বিপরীত দিকে সাঁওতালরা ছিল শান্ত,

কর্মনিষ্ঠ ও জঙ্গল হাসিলে দক্ষ। আর এই কারণেই কোম্পানি অনুমান করেছিল একমাত্র সাঁওতালদের দ্বারাই সম্ভব হবে পাহাড় ও জঙ্গলময় সাঁওতাল পরণার ভূমিতে কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটানো। তাই 'দামিন-ই-কোহ'-তে কৃষিকাজের ও স্থায়ী বসবাসের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার সাঁওতালদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু যখন সাঁওতালরা এই অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস গড়ে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটায় তখন এই এলাকাটিকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নিয়ে আসা হয়; যার দরুন সাঁওতালদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কাঠামো, বিশেষ করে যৌথ মালিকানা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এরই প্রতিবাদে ১৮৫৫-৫৬ সালে সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ।

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করার পর এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ঔপনিবেশিক সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বিভিন্ন আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাঁওতাল গ্রাম সমাজের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে সাঁওতাল সমাজ একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে বাধা পড়ে যায়। মাঝি বা গ্রাম প্রধানকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও তাকে যুক্ত করা হয় ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে। আবার সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মাঝি বা গ্রাম প্রধানকে নামমাত্র পদে বহাল রেখে শুধু মাত্র তদারকির কাজ দেওয়া হয়, আর মূল ক্ষমতার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত থাকে সরকারি আমলারা। শুধু তাই নয় ব্রিটিশদের পুলিশি ব্যবস্থা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা সবগুলিই আরোপিত হয় সাঁওতাল সমাজের উপর। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসরণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হলেও বাস্তবে দেখা যায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আইনগুলিই নতুনরূপে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। নেহরুর পঞ্চশীলে আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যাটি ছিল মূলত অর্থনৈতিক। সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সংস্কৃতির পরিবর্তনও অনিবার্য। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী তথা সাঁওতালদের আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাস্তবে এক বিপরীত চিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল। জাতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করার যে ব্যর্থতা সেটি মূলত নীতি নির্ধারকদের মধ্যেই নিহিত ছিল। উন্নয়ন

বিষয়ক আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো প্রতিফলন এই নীতিগুলিতে পরিলক্ষিত হয়নি। আমলাতান্ত্রিক অনিহা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল। উহাদরণস্বরূপ বলা যায়, জমি হস্তান্তর এবং অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইনত গ্রামসভাগুলির অনুমতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কার্যত দেখা যায় বৃহৎ শিল্প কারখানা, খনি অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ এবং অরণ্যের উপর অধিকার হস্তচ্যুত হয়ে থাকে। সংবিধানে সংরক্ষণের যে সুবিধাগুলি ছিল সেগুলি গ্রহণ ক্ষমতার জন্য সাঁওতাল অর্থনীতি ও শিক্ষার যে বুনিয়াদ তৈরির প্রয়োজন তা সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়। অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়নের ব্যর্থতা থেকে পুনরায় Self Government–এর দাবি ওঠে, আর এই ভাবনা থেকে গড়ে ওঠে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। কিন্তু ঝাড়খণ্ড গড়ে উঠলেও সেখানে 'এলিট' আদিবাসী এবং হিন্দুদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সাধারণ আদিবাসীরা সব দিক থেকেই বঞ্চিত থেকে থেকে যায়। আবার মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা সাঁওতাল- সংস্কৃতি নানা ভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলির মাধামে বলা যায় যে ১৮৫৫- ১৯৬৪ সালের মধ্যে নানান সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাদের মূল সত্তা থেকে।